সোনামনিদের হাদীস শিক্ষা আসর-১

[বাংলা– Bengali – بنغالي]

আলী হাসান তৈয়ব

সম্পাদনা : ড. আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া

2013-1435

IslamHouse.com

﴿دروس الحديث للأطفال-1﴾

« باللغة البنغالية »

علي حسن طيب

مراجعة:د/ أبو بكر محمد زكريا

2013 - 1435

IslamHouse.com

পূর্বকথা

ঘুমিয়ে আছে জাতির পিতা সব শিশুরই অন্তরে। আজকের শিশু আগামী দিনের ভবিষ্যত। শিশুদের হাতেই নির্মিত হবে আমাদের আগামীর দিনগুলো। কথাগুলো আমরা প্রায়ই বলে থাকি। এসব বাক্য থেকে শিশুদের সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে গড়ে তোলার গুরুত্ব সহজেই অনুমেয়। এরা যদি যোগ্য, নৈতিকতাসম্পন্ন ও আদর্শে বলীয়ান হয়ে গড়ে ওঠে তাহলে আমাদের ভবিষ্যত আলোকিত হবে। অন্যথায় তা হবে তমসাপূর্ণ।

শিশুদের মেধার সুষ্ঠু বিকাশ ও নৈতিকতার উন্মেষ ঘটাতে সবচেয়ে জরুরী তাদের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা নিশ্চিত করা। তাদের পর্যাপ্ত সুস্থ বিনোদন ও নির্মল পঠনসামগ্রীর ব্যবস্থা করা। এতে ব্যর্থ হলে তারা ছুটবে অসুস্থ জগতে। বিশেষত অবাধ অনলাইন প্রযুক্তির বদৌলতে আজকাল শিশুদের ভবিষ্যত হুমকির মুখে। দুঃখজনক হলেও সত্য, বাংলা সাহিত্যে সবচেয়ে বেশি অভাব দেখা যায় নৈতিকতাসম্পন্ন শিশুসাহিত্যের। এ অভাব ঘুচানোর সামান্য প্রচেষ্টার অংশ হিসেবেই এ পুস্তিকা রচনা মাথায় আসে। শিশুদের আদর্শ জীবন গড়ার সবচেয়ে বিশ্বস্ত ও স্বার্থক পাথেয় রয়েছে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ গুণাবলিসম্পন্ন মানুষ মহানবী সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস ভাণ্ডারে। তাই শিশুদের জন্য নৈতিকতার পাঠসম্বলিত হাদীসের পাঠ সিরিজের আয়োজন। সেই সিরিজের এটি প্রথম বই। আল্লাহর রহমত প্রলম্বিত হলে অচিরেই সিরিজের পরবর্তী বইগুলোও আলোর মুখ দেখবে।

সাহিত্য বোধসম্পন্ন বলতেই জানেন, সাহিত্যের সবচেয়ে কঠিন ও অনায়াস শাখার অপর নাম শিশুতোষ রচনা | অনেকে চেষ্টা করেও এতে সফল হতে পারেননি। তাদের তুলনায় আমি আরও অযোগ্য। তবুও আমার সদিচ্ছা ও চেষ্টা যদি আল্লা হ কবুল করেন, তাহলে অযোগ্যের জন্য যোগ্যতর হওয়া বিচিত্র কিছু নয়।

এ ধরনের বইয়ের বহুল প্রচার দরকার। কোনো উদ্যোগী প্রকাশক এগিয়ে এলে দ্রুত বইটি শেষ করে তার হাতে তুলে দিতে পারতাম। কিংবা যে কোনো দীনের প্রচারকামী নেককার ভাই-বোন প্রকাশের খরচের ভার নিলে ব্যক্তিগত উদ্যোগেও এটি প্রকাশ করা যাবে। আল্লাহ আমাদের সকল নেক আমল কবুল করুন।

আলী হাসান তৈয়ব

মুঠোফোন : ০১৯১৩১৮৬৩৭২

alihasantaib@gmail.com

প্রতিবেশিকে কষ্ট দিও না

আবূ শুরাইহ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«وَاللّٰهِ لاَ يُؤْمِنُ، وَاللّٰهِ لاَ يُؤْمِنُ، وَاللّٰهِ لاَ يُؤْمِنُ» قِيلَ: وَمَنْ يَا رَسُولَ اللّٰهِ؟ قَالَ: «الَّذِي لاَ يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَايِقَهُ»

'আল্লাহর শপথ সে মুমিন নয়, আল্লাহর শপথ সে মুমিন নয়, আল্লাহর শপথ সে মুমিন নয় । জিজ্ঞেস করা হলো হে আল্লাহর রাসূল কে মুমিন নয় ? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যার অনিষ্ট থেকে তার প্রতিবেশি নিরাপদ নয়' । [বুখারী : ৬০১৬]

আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ لَا يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ»

'ওই ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না যার প্রতিবেশি তার অনিষ্ট থেকে নিরাপদ নয়'। [মুসলিম : ৪৬]

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা : মানুষ সামাজিক জীব। সমাজ থেকে দূরে গিয়ে মানুষ বেশি দিন টিকতে পারে না। পরিবারের বাইরে যারা আমাদের পাশাপাশি বসবাস করেন তারাই আমার প্রতিবেশি। আমাদের বাড়ির আশপাশের লোকজন, বিদ্যালয়ের সহপাঠীরা, মাঠে খেলার সাথীরাও এর অন্তর্ভুক্ত। এদের কাউকে আমরা কষ্ট দিতে পারি না। মুমিন তথা আল্লাহর প্রিয় বান্দা হতে হলে আমাদের অবশ্যই চারপাশের লোকজনকে কষ্ট দেয়ার মতো কাজগুলো থেকে বিরত থাকতে হবে।

তোমার হাত থেকে পড়ে গিয়ে হয়তো কাঁচের আয়না বা ওষুধের বোতল ভেঙ্গে গেল, অমনি তুমি আম্মুর বকুনির ভয়ে জানালা দিয়ে পাশের রাস্তায় ভাঙ্গা কাঁচগুলো ফেলে দিলে। কিংবা আব্বু তোমার জন্য কলা আনলেন, তুমি সে কলা খেয়ে বেখেয়ালে তার ছাল ফেলে দিলে পাশের বাড়ির লোকদের চলার পথে। বুঝতেই পারছ এতে করে কী হতে পারে। পাশের বাড়ির বুড়ো নানু নামাজ পড়তে যাবার সময় ওই কলার ছালে পা পিছলে ধপাস করে পড়ে যাবেন। নয়তো ও বাড়ির খালাম্মার পায়ে বিঁধবে ওই ভাঙ্গা কাঁচ।

তাঁর পা কেটে রক্ত বেরিয়ে সেই লঙ্কাকাণ্ড বেঁধে যাবে। কতই না কষ্ট পাবেন তারা!?

আর বিদ্যালয়ে পড়তে গিয়ে কিংবা বিকেলে মাঠে খেলতে গিয়েও আমরা মানুষকে কষ্ট দিয়ে বসি। দুষ্টুমি করে হয়তো একজনের কলম বা পেন্সিল নিলে কিংবা সহপাঠীর জুতো নিয়ে গেলে বাথরুমে। এদিকে বেচারা তো খুঁজে পেরেশান । আম্মুর বকুনির ভয়ে অস্থির। অথবা মাঠে গিয়ে লক্ষ্য না করে বাবার সঙ্গে হাঁটি হাঁটি পা পা করে চলতে থাকা বাচ্চাটিকে দিলে জোরসে বল মেরে। চিৎকার করে ও কান্না জুড়ে দিল । এতে করে শুধু ওই বাবুটিই নয়; তার মা-বাবাও কষ্ট পেতে পারেন। এভাবেই আমরা অবচেতনে প্রতিবেশিদের কষ্ট দিয়ে ফেলি।

আমাদের প্রিয় নবীজী বলেছেন মানুষকে কষ্ট দেবার মতো সব কাজ বাদ দিতে। মানুষকে কষ্ট দেবার মতো কিছু না করতে বা বলতে। হ্যা, শুধু কাজ দিয়েই নয়; মুখের কথা দিয়েও মানুষকে কষ্ট দিয়ে ফেলি আমরা। যেমন ধরো, মাঠে ক্রিকেট বা ফুটবল খেলতে গিয়ে তোমারই মতো আরেক ছেলের সঙ্গে ধাক্কা লেগে গেল, সে কিন্তু ইচ্ছে করে এমন করেনি। এখন তুমি যদি

প্রতিশোধ হিসেবে তাকে একটা ধাক্কা দাও তাহলে সে যেমন কষ্ট পাবে, তেমনি তাকে একটা অভদ্র ভাষায় বকা দিলেও সে মনে কষ্ট নেবে। অতএব এমন টুকিটাকি বিষয়ে ধৈর্য ধরাই হবে উত্তম। মানুষকে কটু কথা একদমই বলা যাবে না।

সত্য বলো, মিথ্যে বলো না

আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«إِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى البِرِّ، وَإِنَّ البِرَّ يَهْدِي إِلَى الجَنَّةِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ حَتَّى يَكُونَ صِدِّيقًا. وَإِنَّ الكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الفُجُورِ، وَإِنَّ الفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا»

‘নিশ্চয় সত্য পুণ্য বা ভালো কাজের পথ দেখায় আর ভালো কাজ বা পুণ্য জান্নাতের পথ দেখায়। [এভাবে] একজন ব্যক্তি সত্য বলতে বলতে [আল্লাহ ও মানুষের কাছে] সত্যবাদী হিসেবে গণ্য হয়। [পক্ষান্তরে] মিথ্যা অপরাধের পথ দেখায় আর অপরাধ জাহান্নামের দিকে ধাবিত করে। [এভাবে] একজন ব্যক্তি মিথ্যা বলতে বলতে (আল্লাহ ও মানুষের কাছে) মিথ্যাবাদী হিসেবে লিপিবদ্ধ হয়ে যায়’। (বুখারী : ৬০৯৪; মুসলিম : ৬৮০৩)

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা : সত্যবাদিতা একটি প্রশংসনীয় ও সর্বজন প্রিয় গুণ। সত্যবাদিতা মানুষকে অন্যের কাছে প্রিয় বানায়। অপরের দৃষ্টিতে বানায় সম্মানিত ও গ্রহণযোগ্য। সত্য মানুষকে অসংখ্য পাপ থেকে রক্ষা করে। পুণ্য বা নেকির পথে পরিচালিত করে।

কেউ যখন প্রতিনিয়ত সত্য বলার অভ্যাস গড়ে তোলে, তখন সত্য বলা তার স্বভাবে পরিণত হয়।

এ পর্যায়ে উন্নীত হলে আল্লাহ তার নাম লিপিবদ্ধ করেন সেই সব সত্যবাদীদের তালিকায়, যাদেরকে বলা হয় ‘সি দ্দীক’ তথা মহাসত্যবাদী। কিয়ামতের দিন যারা আল্লাহর বিশেষ মর্যাদা লাভের মধ্য দিয়ে নবী ও শহীদদের সঙ্গে ভিআইপি বা বিশেষ সম্মানের পাত্র হিসেবে গণ্য হবেন।

পক্ষান্তরে মিথ্যা মানুষের কাছে একটি ঘৃণিত ও চির নিন্দিত স্বভাব। মিথ্যাবাদীকে খোদ তার আপনজনেরাও অপছন্দ করে। মিথ্যা মানুষকে পাপের পথে পরিচালিত করে। একটি সামান্য পাপ বহু পাপের দিকে পরিচালিত করে। এভাবে পাপ করতে করতে সে বেখেয়ালে জাহান্নামের পথে ধাবিত হয়। আগুনের চির আবাস হয়ে যায় তার গন্তব্য। মানুষ যখন অহরহ মিথ্যা বলতে থাকে, মিথ্যা বলা তার স্বভাবে পরিণত হয়। মিথ্যাকথন স্বভাবে পরিণত হলে আল্লাহ তাকে কায্যাব বা ‘মহামিথ্যাবাদী’র তালিকাভুক্ত করেন।

বিষয়টি আরেকটু খোলাসা করা যাক। ধরো, তোমরা মাদরাসা বা বিদ্যালয়ে যাও, সেখানে কিন্তু তোমার আব্বু-আম্মু সঙ্গে থাকেন না। ফলে সেখানে তুমি কী করছো না করছ তা তাঁরা দেখেন না। তুমি হয়তো টিফিন বা ছুটির সময় খেলতে গিয়ে তোমার সহপাঠীকে অপ্রত্যাশিতভাবে মেরে বসলে কিংবা ক্লাসে বসার জায়গা নিয়ে একে অন্যের সঙ্গে হুড়োহুড়ি করতে গিয়ে হালকা মারামারিতে জড়িয়ে গেলে অথবা সুযোগ পেলে তোমার পাশে বসা ছেলেটির পেন্সিল বা বই লুকিয়ে রাখলে- সবগুলোই কিন্তু অপরাধ। কোনোটাই তোমার করা উচিত নয়। এখন তুমি যদি ভাবো, আম্মুর কাছে ফিরে গিয়ে এসব বলতে হবে, সত্যি সত্যি সব বিবরণ দিতে হবে, তখন আম্মু তোমাকে বকে দেবেন কিংবা তোমার আচরণে মনে কষ্ট নেবেন যা তুমি মোটেও কামনা কর না, তাহলে এ চিন্তাই তোমাকে বাধা দেবে এসব করা থেকে। এ ক্ষেত্রে যদি মিথ্যে বলতে যাও তবে দেখ কত বিপত্তি দেখা দেবে। তুমি যদি বিদ্যালয় থেকে ফিরে আম্মুর কাছে ওসব দুষ্টুমির কথা গোপন করো আর তাঁর জিজ্ঞাসার উত্তরে বলো, আমি আজ স্কুলে কোনো দুষ্টুমি করিনি আম্মু, তাহলে একটি মিথ্যে বললে।

এরপর পরেরদিন যখন যার সঙ্গে দুষ্টুমি করেছো তার আম্মু এসে বিচার দেবেন, তখন এই একটি মিথ্যে লুকাতে গিয়ে তোমাকে অনেকগুলো মিথ্যার আশ্রয় নিতে হবে। তারপরও কিন্তু তুমি সত্য ঘটনা আড়াল করতে পারবে না। সত্য বেরিয়েই আসবে। তখন কী হবে? আম্মু খুব কষ্ট পাবেন। ভাববেন যে ছেলেটাকে আমি এত আদর করি, রোজ তার জন্য সব কিছু করে দেই, রাত জেগে ওর অসুখের সময় সেবা করি সে কিনা মিথ্যে বলে! সেই আমাকে অন্যের কাছে ছোট করে!

এখন ভেবে দেখো, একটি মিথ্যে বলার কারণে তোমাকে অনেকগুলো মিথ্যে বলতে হলো। তারপর ধরা খেয়ে লজ্জিত হতে হলো। সর্বোপরি মাকে মনে কষ্ট দিয়ে জাহান্নামের আগুনে জ্বলার সম্ভাবনা সৃষ্টি হলো। অথচ প্রথমেই যদি তুমি সত্য বলে দিতে, তাহলে আম্মু তোমাকে বুঝিয়ে দিতেন এসব করতে নেই। এতে করে মিথ্যেও বলতে হত না। আবার তাঁকে কষ্ট দিয়ে জাহান্নামের দিকেও যেতে হয় না। বরং সত্য বলার সুবাদে তুমি সত্যবাদী হয়ে আল্লাহকে খুশি করে জান্নাতের পথিক হতে পারতে।

এ জন্যই বহু হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিথ্যা থেকে সতর্ক করেছেন। সত্য ও সত্যবাদিতায় উদ্বুদ্ধ করেছেন। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনও মিথ্যাকে নিরুৎসাহিত ও সত্যকে উৎসাহিত করেছেন। ইরশাদ হয়েছে,

﴿ إِنَّمَا يَفْتَرِى ٱلْكَذِبَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِـَٔايَـٰتِ ٱللَّهِ ۖ وَأُو۟لَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلْكَـٰذِبُونَ ١٠٥ ﴾ [النحل: ١٠٥]

'একমাত্র তারাই মিথ্যা রটায়, যারা আল্লাহর আয়াতসমূহে ঈমান রাখে না। আর তারাই মিথ্যাবাদী'। {সূরা আল-ফুরকান, আয়াত : ১০৫}

তিনি আরও ইরশাদ করেন,

﴿ وَلَا تَقُولُوا۟ لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ ٱلْكَذِبَ هَـٰذَا حَلَـٰلٌ وَهَـٰذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُوا۟ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ١١٦ ﴾ [النحل: ١١٦]

'আর তোমাদের জিহ্বা দ্বারা বানানো মিথ্যার উপর নির্ভর করে বলো না যে, এটা হালাল এবং এটা হারাম, আল্লাহর উপর মিথ্যা রটানোর জন্য। নিশ্চয় যারা আল্লাহর উপর মিথ্যা রটায়, তারা সফল হবে না'। {সূরা আল-ফুরকান, আয়াত : ১১৬}

আরেক সূরায় আল্লাহ বলেন,

﴿ ۞أَلَمۡ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ تَوَلَّوۡاْ قَوۡمًا غَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيۡهِم مَّا هُم مِّنكُمۡ وَلَا مِنۡهُمۡ وَيَحۡلِفُونَ عَلَى ٱلۡكَذِبِ وَهُمۡ يَعۡلَمُونَ ١٤ ﴾ [المجادلة: ١٤]

‘তুমি কি তাদের লক্ষ্য করনি, যারা এমন এক কওমের সাথে বন্ধুত্ব করে যাদের উপর আল্লাহর গযব নিপতিত হয়েছে? তারা তোমাদের দলভুক্ত নয় এবং তোমরাও তাদের দলভুক্ত নও। আর তারা জেনে শুনেই মিথ্যার উপর কসম করে’। {সূরা আল-মুজাদালা, আয়াত : ১৪}

সুতরাং সমাজের সকল অপরাধ থেকে বাঁচতে হলে আমাদেরকে সর্বদা সত্য বলতে হবে। সত্যবাদিতার জীবন গড়তে হবে। আর সর্বোতভাবে পরিহার করতে হবে মিথ্যা ও মিথ্যাবাদিতাকে। আল্লাহ আমাদের সহায় হোন।

হিংসা করো না

‘আনাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«لَا تَحَاسَدُوا، وَلَا تَبَاغَضُوا، وَلَا تَقَاطَعُوا، وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ إِخْوَانًا»

‘তোমরা কারও প্রতি বিদ্বেষভাব রেখ না। পরস্পর হিংসা করো না। বিচ্ছেদভাব রেখ না। বরং একে অন্যের ভাই হয়ে যাও ’। [মুসলিম : ২৫৫৯; বুখারী : ৫১৪৩]

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা : আমরা সামাজিক জীব। সমাজে পাশাপাশি সবাই বসবাস করি। সবাই আমরা জীবনের প্রয়োজনে একে অপরের ওপর নির্ভরশীল। সমাজে যদি সবার সঙ্গে সবার সম্পর্ক ভালো থাকে তাহলে সেখানে শান্তি ও শৃঙ্খলা বিরাজ করে। অন্যথায় সমাজের শান্তি বিঘ্নিত হয়। আমাদের মনের সুখ অচিন পাখির মতো সুদূরে উড়াল দেয়। আলোচ্য হাদীসে সামাজিক শান্তি যাতে নষ্ট না হয় এ জন্য কিছু বর্জণীয় বিষয়ের ব্যাপারে রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের সতর্ক করেছেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে পরস্পর হিংসা ও বিদ্বেষ এবং অমিল ও বিভেদের মনোভাব দূর করতে বলেছেন। আর বসবাস করতে বলেছেন পরস্পরে ভাইয়ের মতো আপন হয়ে।

যে বিশেষণগুলো মানুষের উন্নতির পথে প্রধান অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়, মানুষকে আল্লাহ ও তাঁর অপরাপর বান্দার কাছে অপ্রিয় করে তোলে তার অন্যতম হলো হিংসা বা পরশ্রীকাতরতা। কেউ হয়তো তোমার চেয়ে দেখতে সুন্দর অথবা কেউ তোমাদের চেয়ে ধনী। রোজ স্কুলে এসে ও তোমার সামনে এটা সেটা কিনে খায়, দামি আর ভারি সুন্দর সব পোশাক পরে আসে। তুমি যদি এসব দেখে ভেতরে ভেতরে জ্বলতে থাক। কামনা করতে লাগ, তুমি ওর মত হয়ে যাও আর সে হয়ে যাক তোমার মত গরিব বা অসহায় তবে এটিই সে অন্তরের ব্যধি আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যাকে হিংসা বলে নিন্দা করেছেন। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

﴿ أَمۡ يَحۡسُدُونَ ٱلنَّاسَ عَلَىٰ مَآ ءَاتَىٰهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضۡلِهِۦۖ ﴾ [النساء: ٥٤]

'আল্লাহ মানুষকে তার যে অনুগ্রহ দান করেছেন তার ওপর কি তারা হিংসা করে? {সূরা আন-নিসা, আয়াত : ৫৪}

অপর আয়াতে আল্লাহ হিংসুকের অকল্যাণ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করার জন্য তাঁর নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে উদ্দেশ করে বলেন,

﴿ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ۝٥ ﴾ [الفلق: ٥]

'এবং (আপনি আশ্রয় প্রার্থনা করুন) হিংসুকের অনিষ্ট থেকে যখন সে হিংসা করে'। {সূরা আল-ফালাক, আয়াত : ৫}

আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«إِيَّاكُمْ وَالْحَسَدَ، فَإِنَّ الْحَسَدَ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ، كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ»

‘তোমরা হিংসা-পরশ্রীকাতরতা থেকে বেঁচে থাক। কেননা হিংসা-পরশ্রীকাতরতা নেকিকে খেয়ে ফেলে, যেমন আগুন খেয়ে ফেলে কাঠের খড়ি’। [আবূ দাউদ : ৪৯০৩[1]]

কুরতুবী নামক তাফসীর গ্রন্থে বলা হয়েছে, আকাশে সর্বপ্রথম অনুষ্ঠিত গোনাহ হচ্ছে এই হিংসা-পরশ্রীকাতরতা, যা শয়তান বাবা আদমের (আলাইহিস সালাম) প্রতি হিংসাপরায়ণ হয়ে করেছিল। তেমনি পৃথিবীর সর্বপ্রথম পাপ ও হচ্ছে হিংসা , যা আদম আলাইহিস সালামের ছেলে কাবিল তার ভাই হাবিলের প্রতি করেছিল। হিংসা-পরশ্রীকাতরতা কতটুকু পাপের কাজ তা ওপরে উল্লেখিত আয়াত ও হাদীস দুটি থেকে বোঝা যায়। হিংসা যে করবে সে শয়তানের দলের লোক সাব্যস্ত হবে। হিংসাকারীর দু‘আ কবুল হয় না। হিংসার কারণে নেক আমল নষ্ট হয়ে যায়। আল্লাহর ক্রোধের পাত্র হতে হয়। তাছাড়া এই হিংসা-পরশ্রীকাতরতা এমন এক ব্যধি যার কারণে সারা দুনিয়ার মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। হিংসাকারী স্বয়ং বিভিন্ন মানসিক যাতনায় ভোগে।

---

[1]. দুর্বল সূত্রে বর্ণিত।

সর্বদা দুশ্চিন্তা করে। এমন মর্মপীড়ায় ভোগে যার কোনো প্রতিকার নেই। হিংসার অনলেই সে জ্বলে-পুড়ে ছাই হয়।

আল্লাহ আমাদের যাকে যা দিয়েছেন, তার ওপর সন্তুষ্ট থাকতে হবে। তিনি সমাজে ধনী-গরীব সৃষ্টি করেছেন। কাউকে শারীরিক পূর্ণতা দিয়েছেন কাউকে অপূর্ণতা দিয়ে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। এসবে মানুষের কোনো হাত নেই। এর রহস্যও কেবল তিনি জানেন। এ বোধ যদি আমরা ভেতরে লালন ও পালন করি, তাহলে প্রশান্ত হয়ে উঠবে মন। শান্তিতে ভরে উঠবে আমাদের সবার জীবন।

বিপদে ধৈর্য ধরো

আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত , রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«مَا مِنْ مُصِيبَةٍ يُصَابُ بِهَا الْمُسْلِمُ، إِلَّا كُفِّرَ بِهَا عَنْهُ حَتَّى الشَّوْكَةِ يُشَاكُهَا»

'মুমিনকে যে কোনো বিপদই স্পর্শ করুক না কেন আল্লাহ তার বিনিময়ে তার গুনাহ মাফ করে দেন। এমনকি (চলতি পথে) পায়ে যে কাঁটা বিঁধে (তার বিনিময়েও গুনাহ মাফ করা হয় ')। [বুখারী : ৫৬৪০; মুসলিম : ৬৭৩০]

আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُصِبْ مِنْهُ»

'আল্লাহ যার ভালো চান , তাকে বিপদ দেন '। [বুখারী : ৫৬৪৫ ; মুসনাদ আহমদ : ৭২৩৪]

পার্থিব জীবনে মুমিনকে যত ছোট কষ্ট আর বিপদই স্পর্শ করুক না কেন তাতে আল্লাহ তার কোনো না কোনো মঙ্গল নিহিত রাখেন। আমরা বুঝি আর না বুঝি আল্লাহ আমাদের ভালোবাসেন বলেই এই পরীক্ষায় ফেলেন। তাই আমাদের কর্তব্য হবে , কোনো

বিপদে বিচলিত কিংবা অধৈর্য না হয়ে আল্লাহর প্রতি আস্থা রাখা। তাঁরই শরণাপন্ন হওয়া এবং ধৈর্যশীল বান্দার পরিচয় দেয়া।
এ ধৈর্যকে আরবীতে বলা হয় সবর। সবর মানুষের একটি ভেতরগত উত্তম স্বভাব, যার মাধ্যমে সে অসুন্দর ও অনুত্তম কাজ থেকে বিরত থাকে। এটি মানুষের এক আত্মিক শক্তি যা দিয়ে সে নিজেকে সুস্থ্য ও সুরক্ষিত রাখতে পারে। সবর আল্লাহর পরিপূর্ণ মুমিন বান্দাদের বৈশিষ্ট্য। আল্লাহ যাকে এ গুণ দেন ; কেবল সেই এ গুণে সুসজ্জিত হয়। নবী-রাসূল আলাইহিস সালামদের আল্লাহ এ বিরল গুণে ভূষিত করেছিলেন। আল্লাহ ও তাঁর রাসূল বিভিন্নভাবে সবরের গুরুত্ব বর্ণনা করেছেন।
ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রহ. বলেন , পবিত্র কুরআনে আল্লাহ নব্বই জায়গায় সবরের কথা বলেছেন। অতএব বন্ধুরা , ভেবে দেখো সবর কত গুরুত্বপূর্ণ!
আল্লাহ সবরকে এমন এক শক্তি বানিয়েছেন যা কখনো ব্যর্থ হয় না, এমন তীর বানিয়েছেন যা লক্ষভ্রষ্ট হয় না , এমন বিজয়ী সৈনিক বানিয়েছেন যে কখনো পরাজিত হয় না , এমন সুরক্ষিত দূর্গ বানিয়েছেন যা কখনো ধ্বংস হয় না। সবর আর বিজয় দুই সহোদরের মতো। যে সবর করবে সফলতা তার পদচুম্বন করবে। মানুষ তার দুনিয়া ও আখিরাতের বিষয়ে সবরের মতো এমন কোনো অস্ত্রে সজ্জিত হয় না , যা তার নফস ও শয়তানকে

নিশ্চিতভাবে হারিয়ে দেয়। সেই বান্দার কোনো শক্তিই নেই , যার গুণাবলির মধ্যে সবর তথা ধৈর্য নেই। সেই বান্দা বিজয়ও ছিনিয়ে আনতে পারে না যে সবরকারী বা ধৈর্যশীল নয়। তাইতো আল্লাহ কুরআনে বলেছেন,

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱصۡبِرُواْ وَصَابِرُواْ وَرَابِطُواْ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ ٢٠٠ ﴾ [ال عمران: ٢٠٠]

'হে মুমিনগণ, তোমরা ধৈর্য ধরো ও ধৈর্যে অটল থাকো এবং পাহারায় নিয়োজিত থাক। আর আল্লাহকে ভয় কর, যাতে তোমরা সফল হও'। {আলে-ইমরান : ২০০}

আমাদের জীবনে সবরের কোনো বিকল্প নেই। আল্লাহর বান্দা মাত্রেই সবর করতে হবে। কেননা কখনো আল্লাহর আদেশ মানতে হবে, তাঁর নির্দেশিত কাজ করতে হবে। আবার কখনো তাঁর নিষেধ মেনে চলতে হবে , বিরত থাকতে তা করা থেকে। আবার কখনো সহসা তাকদীরের কোনো ফয়সালা এসে পড়া র কারণে বিপদে পড়তে হ বে। তখন সবর করতে হবে। যখন নেয়ামত দেয়া হবে , তখন শুকরিয়া করতে হবে। এভাবে নানা অবস্থার মধ্য দিয়ে মুমিনের জীবন অতিবাহিত হয়। সুতরাং মৃত্যু পর্যন্ত এই সবরকে সঙ্গে নিয়েই চলতে হবে।

মনে রাখতে হবে, মুমিনের পুরো জীবনই পরীক্ষায় ভরা। প্রতিটি মুমিনকে আল্লাহ ভালো-মন্দ উভয় অবস্থা দিয়ে পরীক্ষা করেন।

তিনি যাকে ধন বা গুণ দিয়েছেন এবং যাকে দেন নি- উভয়ই পরীক্ষার জন্য। যাকে দিয়েছেন তার পরীক্ষা সে অহংকার করে কিনা। যাকে দেন নি তার পরীক্ষা সে না পেয়ে সবর আর শোকর করে কিনা। আল্লাহ যেমন বলেন,

﴿ وَنَبۡلُوكُم بِٱلشَّرِّ وَٱلۡخَيۡرِ فِتۡنَةٗۖ وَإِلَيۡنَا تُرۡجَعُونَ ٣٥ ﴾ [الانبياء: ٣٥]

‘আর ভালো ও মন্দ দ্বারা আমি তোমাদেরকে পরীক্ষা করে থাকি এবং আমার কাছেই তোমাদেরকে ফিরে আসতে হবে ’। {সূরা আল-আম্বিয়া, আয়াত : ৩৫}

আল্লাহ আমাদের সকলকে সবরের মতো মহৎ গুণের অধিকারী বানান। আমাদেরকে ধৈর্যশীল বান্দা হবার তাওফীক দিন। আমীন।

বড়দের সম্মান করো

আবদুল্লাহ ইবন আমর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

«لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا، وَيَعْرِفْ حَقَّ كَبِيرِنَا»

‘সে আমার দলভুক্ত নয় যে আমাদের ছোটকে স্নেহ করে না এবং আমাদের বড়দের সম্মান করে না এবং’ । [মুসনাদ আহমদ : ৬৯৩৭]

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা : বাবা-মাকে বেশি বিরক্ত করলে তাঁরা যেমন বলেন, ‘যা তুই এমন করলে আমি আর তোর মা বা বাবা নই’, তেমন নবীজীও বলছেন, বড়কে অশ্রদ্ধা করলে তোমরাও আমার উম্মত নও। বাবা-মার এমন কথায় যেমন আমরা তাঁদের সন্তানতালিকা থেকে বাদ পড়ি না, আমরাও তেমন নবীর উম্মত থেকে বাদ যাব না বটে। কিন্তু এটা এতই অপ্রিয় ও নিন্দনীয় কাজ যে আমি যেন এমন স্বভাব নিয়ে মহান চরিত্রবান নবীর উম্মত হবার যোগ্যতাই হারিয়ে ফেলি।

বিস্তারিত আলোচনা : বন্ধুরা, আমাদের চারপাশে যারা বড় আছেন, চাই তিনি বয়সে বড় হোন, জ্ঞানে বড় হোন আর পদে বড় হোন- তাঁদের সম্মান করা ইসলামের শিক্ষা। যে বড়কে সম্মান করে না,

শ্রদ্ধেয়কে শ্রদ্ধা করে না এবং গুরুজনকে অসম্মান করে, পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ সচ্চরিত্রের অধিকারী মহামানব নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন সে তাঁর উম্মতভুক্ত নয়। ভেবে দেখ, তিনি গুরুজনের প্রতি অনাকাঙ্ক্ষিত আচরণ এতই অপছন্দ করতেন যে এমন কঠিন কথা বলে আমাদের সচেতন করতে চেয়েছেন। বড়দের অসম্মান না করতে আমাদের সাবধান করেছেন।

বড়কে সম্মান করার অর্থ চলাফেরা ও কথাবার্তায় তাঁদের প্রতি সম্মান বজায় রাখা। সামাজিক কর্মকাণ্ডে তাঁদের অগ্রাধিকার দেয়া। কোনো কাজ করতে গিয়ে তাঁদের সামনে রাখা। পরিবারে, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে কিংবা যানবাহনে বা সভা-সমাবেশে বড়দের জন্য আসন ছেড়ে দেওয়া। একটি হাদীস তুলে ধরা যাক, দেখ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুবক সাহাবীদের কিভাবে বড়দের প্রতি সম্মান দিতে শিখিয়েছেন। মালেক ইবন হুয়াইরিছ রাদিয়াল্লাহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَفَرٍ مِنْ قَوْمِي، فَأَقَمْنَا عِنْدَهُ عِشْرِينَ لَيْلَةً، وَكَانَ رَحِيمًا رَفِيقًا، فَلَمَّا رَأَى شَوْقَنَا إِلَى أَهَالِينَا، قَالَ: «ارْجِعُوا فَكُونُوا فِيهِمْ، وَعَلِّمُوهُمْ، وَصَلُّوا، فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلاَةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ، وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ»

সগোত্রীয় একটি দল নিয়ে আমি নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে গেলাম। আমরা তাঁর কাছে বিশ রাত অবস্থান

করলাম। তিনি ছিলেন দয়ালু ও কোমলপ্রাণ। তিনি আমাদের নিজ নিজ পরিবারের প্রতি আমাদের মনের টান লক্ষ্য করে বললেন, 'তোমরা (নিজেদের পরিবারে) ফিরে যাও। তাদের মাঝে অবস্থান কর আর তাদের (তোমরা যা শিখলে তা) শেখাও এবং (তাদের নিয়ে) সালাত আদায় কর। যখন সালাতের সময় হয় তখন তোমাদের একজন আযান দেবে আর তোমাদের মধ্যে যে বড় সে ইমামতী করবে।' [বুখারী : ৬২৮; মুসলিম : ৬৭৪]

প্রখ্যাত হাদীস বিশারদ ইমাম কাজী আবু ইয়া 'লা রহ. একবার পথচলার সময় তাঁর শিষ্যকে বললেন, 'তুমি যখন কোনো শ্রদ্ধেয় ব্যক্তির সঙ্গে পথ চলবে তখন তাঁর কোন দিকে থাকবে ?' আমি বললাম, আমার তা জানা নেই। তিনি বললেন, 'তাঁকে ইমামের স্থানে রাখবে। অর্থাৎ তুমি থাকবে ডান দিকে আর বাম দিক তার জন্য ছেড়ে দেবে। যাতে করে থুথু ফেলা বা নাক পরিষ্কারের প্রয়োজন হলে তিনি অনায়াসে বাম দিকে তা করতে পারেন।'

ভেবে দেখ, তাহলে বড়দের প্রতি কতটা বিনয়ী ও শ্রদ্ধাপরায়ণ হতে হবে। কতটা ভক্তি ও সম্মান দেখিয়ে তাঁদের দো 'আ নিতে হবে। বড় যদি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে তোমার চেয়ে কম যোগ্যতাসম্পন্নও হন, তবুও তাঁকে ছোট করে কথা বলবে না। তাঁর সামনে ভুলেও বড়াই দেখাবে না। তুমি যদি আজ তাঁকে অশ্রদ্ধা করে মনে কষ্ট দাও, কালই কিন্তু তোমার চেয়ে ছোট কারও কাছ থেকে একই

ব্যবহার পেয়ে যাবে। তখন ঠিকই বুঝতে পারবে তিনি তোমার আচরণে কেমন মর্মযাতনায় ভুগেছিলেন।

বড়দের দেখে সালাম দাও। মসজিদের কাতারে সামনে তাঁদের এগিয়ে দাও। তাঁদের সামনে দিয়ে দৌড় দেবে না। অকারণে তাঁদের সামনে চেঁচামেচি বা শোরগোল করবে না। তাঁরা কিছু চাইলে দূর থেকে নিক্ষেপ না করে সবিনয়ে গিয়ে তোমার ডান হাত দ্বারা দাও। আপ্যায়নে র ক্ষেত্রে বড় ও বিশিষ্ট ব্যক্তিকে অগ্রাধিকার দাও। রাসূলের সাহাবী হুযাইফা রা দিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন, "আমরা যখন আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে কোনো নিমন্ত্রণে যেতাম তখন তাঁর শুরু করার আগে আমরা খাবারে হাত দিতাম না।" [মুসলিম:২০১৭]

ছোটদের স্নেহ করো

আবদুল্লাহ ইবন 'আমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

«لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا، وَيَعْرِفْ حَقَّ كَبِيرِنَا»

'সে আমার দলভুক্ত নয় যে আমাদের ছোটকে স্নেহ করে না এবং আমাদের বড়দের সম্মান করে না এবং' । [মুসনাদ আহমদ : ৬৯৩৭]

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা : ছোটকে স্নেহ বা মায়া করা ইসলামের শিক্ষা। যে ছোটকে স্নেহ করে না, শিশুর প্রতি সদয় হয় না, অনাথ কিশোরকে দেখে মায়াসিক্ত হয় না পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ সচ্চরিত্রের অধিকারী মহামানব নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভাষায় সে তাঁর দলভুক্ত নয়। নবীর কোনো উম্মত ছোটদের প্রতি কঠোর হতেই পারে না। ভেবে দেখ, তিনি ছোটদের কতটা ভালোবাসতেন যে এমন কঠিন কথা বলে আমাদের সচেতন করতে চেয়েছেন। ধরো, বিদ্যালয়ে যাবার পথে একটি শিশুকে দেখলে মলিন পোশাকে শুকনো মুখে কাজ করছে, তুমি তার পাশে গিয়ে মায়া ভরা চোখে তাকও। সে খেয়েছে কিনা খবর নাও। অভাবী হলে সাধ্যমতো তার পাশে দিয়ে দাঁড়াও। তার ব্যথায় সমব্যথী হও।

বাড়িতে যে ছোট্ট কাজের মেয়ে আছে তাকে কাজের আদেশ দিতে এবং অপ্রয়োজনে ধমক দিতেও একবার ভাবো। প্রচণ্ড গরমে রোদে পুড়ে একটি কিশোর ইট ভাঙছে কিংবা কনকনে শীতে হালকা পোশাকে একটি শিশু পানি বয়ে নিয়ে যাচ্ছে- এমন দৃশ্য দেখেও তুমি স্নেহ তাড়িত হও। তাকে সাহায্য করতে চেষ্টা করো। ঈদের সময় নতুন পোশাক আর নোট পেয়ে কেবল নিজে খুশির জোয়ারে গা ভাসিও না; পাশের শিশুটিকেও তাতে শামিল করতে চেষ্টা কর। তাকেও তোমার আনন্দে শরীক কর।

বন্ধুরা, চারপাশে যারা আমাদের বয়সে ছোট আমরা তাদের স্নেহ করব। তাদের ভালোবাসব এবং আদর করব। তারা বিপদে পড়লে এগিয়ে যাব। কোনো বাবু হয়তো পথ চলতে গিয়ে উল্টে পড়ল কিংবা পা হড়কে খাদে বা পথের পাশে পড়ে লজ্জা পেল, তুমি তাকে দেখে হাসতে যেও না। বরং জলদি তার হাত ধরো। তার প্রতি সহমর্মিতা দেখাও। খাবার কিনতে গিয়ে দেখলে অদূরেই একটি শিশু তোমাকে দেখে ফ্যালফ্যালিয়ে তাকিয়ে আছে, তার প্রতিও তুমি সদয় হও। তাকেও কিছু খেতে দাও।

পথশিশুদের প্রতি বিশেষ মায়া দেখাও।

এ মায়া প্রমাণ করবে তুমিও মহানবীর চরিত্রে চরিত্রবান। ছোটদের প্রিয়নবীর আদর্শের অনুসারী তুমি। কেননা তিনি ছোটদের অত্যন্ত স্নেহ করতেন। তাদের ভালো-মন্দের প্রতি

বিশেষ নজর দিতেন। একবার দেখলেন একটি শিশু পথের পাশে কাঁদছে, তিনি তার মাথায় হাত বুলিয়ে নিজের বাসায় নিয়ে যান। আরেকবার একটি শিশুকে দেখলেন যুদ্ধে তার বাবাকে হারিয়ে মন খারাপ করে বসে আছে, তিনি ছন্দ মিলিয়ে কথা বলে তার মুখে হাসি ফোটান।

গীবত বা পরচর্চা থেকে বিরত থাকো

আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীদের উদ্দেশে বললেন,

«أَتَدْرُونَ مَا الْغِيبَةُ؟» قَالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: «ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ» قِيلَ أَفَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ فِي أَخِي مَا أَقُولُ؟ قَالَ: «إِنْ كَانَ فِيهِ مَا تَقُولُ، فَقَدِ اغْتَبْتَهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ فَقَدْ بَهَتَّهُ»

‘তোমরা জানো গীবত কী? সাহাবীগণ বললেন, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলই ভালো জানেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমার ভাই সম্পর্কে তোমার এমন আলোচনা যা সে অপছন্দ করে। বলা হলো, আমার ভাইয়ের মধ্যে যদি তা সত্যিই থাকে তাহলে সে ব্যাপারে আপনি কী বলবেন? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যদি তার মধ্যে সে দোষ থাকে তবেই তো তুমি তার গীবত করলে। আর যদি তার মধ্যে সে দোষ না থাকে তবে তুমি তাকে অপবাদ দিলে।’ [মুসলিম : ২৫৮৯]

ছোট্ট বন্ধুরা, খেয়াল করলে দেখবে আমরা বাসায় বা বিদ্যালয়ে কিংবা খেলার মাঠে বা যে কোনো সভায় কয়েকজন একত্রিত হলে খুব সাধারণভাবেই অন্যের আড়ালে বা অগোচরে মন্দ কথা বলি।

কটু বা অপ্রিয় বাক্য উচ্চারণ করি। আবার গল্প জমাতে কিংবা হাসির তোড়ে অপরের দোষ-ত্রুটিও চর্চা করি। এ কাজের নামই গীবত বা পরচর্চা। আমাদের কেউ পরচর্চা করলে তুমি যদি তাকে বলো ভাই, গীবত করতে নেই। এটা তো খুবই গর্হিত কাজ। দেখবে সে বলবে, আরে, এটা আবার গীবত হয় কী করে; ও তো সত্যিই এমন দোষের অধিকারী।

এ হাদীস থেকে আমরা জানতে পারছি, সত্যিই যদি আলোচনা করা ব্যক্তি ওই দোষের অধিকারী হন তবেই না সেটাকে গীবত বলে গণ্য করা হবে। অন্যথায় সেটা অপবাদের শামিল হবে! আর কারো প্রতি অপবাদ আরোপ করা তো আরও ভয়ঙ্কর অপরাধ।

দেখ, গীবত একটি হারাম কাজ। পরনিন্দা বা পরচর্চা করা কবীরা গুনাহ। শুধু ইসলাম কেন সকল ধর্ম এমনকি সব সমাজের দৃষ্টিতেই পরচর্চা নিন্দনীয় কাজ। পরচর্চার মাধ্যমে পারস্পরিক সম্পর্ক নষ্ট হয়। সমাজে সৃষ্টি হয় অশান্তি আর অনাচার। দয়াময় আল্লাহ কী বলছেন দেখ,

﴿ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱجۡتَنِبُواْ كَثِيرٗا مِّنَ ٱلظَّنِّ إِنَّ بَعۡضَ ٱلظَّنِّ إِثۡمٞۖ وَ لَا تَجَسَّسُواْ وَلَا يَغۡتَب بَّعۡضُكُم بَعۡضًاۚ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمۡ أَن يَأۡكُلَ لَحۡمَ أَخِيهِ مَيۡتٗا فَكَرِهۡتُمُوهُۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۚ إِنَّ ٱللَّهَ تَوَّابٞ رَّحِيمٞ ۝١٢ ﴾ [الحجرات: ١٢]

‘হে মুমিনগণ, তোমরা অধিক অনুমান থেকে দূরে থাক। নিশ্চয় কোনো কোনো অনুমান তো পাপ। আর তোমরা গোপন বিষয়

অনুসন্ধান করো না এবং একে অপরের গীবত করো না। তোমাদের মধ্যে কি কেউ তার মৃত ভাইয়ের গোশ্ত খেতে পছন্দ করবে? তোমরা তো তা অপছন্দই করে থাক। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয় আল্লাহ অধিক তাওবা কবূলকারী, অসীম দয়ালু।' {সূরা আল-হুজুরাত, আয়াত : ১২}

অর্থাৎ পবিত্র কুরআনে কোনো ভাইয়ের অসাক্ষাতে তার দোষচর্চা তথা গীবত করাকে তার গোশত খাওয়ার তুল্য ঘোষণা করা হয়েছে! একবার ভেবে দেখ, এর চেয়ে বড় খারাপ কাজ দুনিয়াতে আর কী হতে পারে? অথচ কী অবলীলায় না আমরা এই কাজটি করে থাকি। আল্লাহ মাফ করুন গীবত ছাড়া তো আমাদের কোনো আসরই জমে না। দেখ, তুমি যদি সালাত না আদায় করে থাক, সাওম পালন না করে থাক যার ফলে গুনাহ করে ফেল, তবে যখনই তোমার বুঝ হবে আল্লাহর কাছে নিষ্ঠার সঙ্গে তওবা করলে আল্লাহ মাফ করে দেবেন। কিন্তু গীবতের মতো কবীরা গুনাহ করলে মাফ চাইলেও আল্লাহ ক্ষমা করবেন না হয়তো। যাবৎ না তুমি ওই ভাইয়ের কাছ থেকে মাফ চেয়ে নিচ্ছো। কারণ, দোষচর্চার মধ্য দিয়ে তুমি তার হক নষ্ট করেছো। অতএব তার কাছ থেকেই মাফ নিতে হবে।

অতএব চলো পরনিন্দা আর গীবত করা থেকে বিরত থাকি এবং গীবতকারীর নিকট মাপ চেয়ে নিজেকে আখেরাতের জন্য তৈরি করি।

অহংকার করো না

‘আব্দুল্লাহ ইবন মাসঊদ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সালালাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ» قَالَ رَجُلٌ: إِنَّ الرَّجُلَ يُحِبُّ أَنْ يَكُونَ ثَوْبُهُ حَسَنًا وَنَعْلُهُ حَسَنَةً، قَالَ: «إِنَّ اللهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ، الْكِبْرُ بَطَرُ الْحَقِّ، وَغَمْطُ النَّاسِ»

‘যার মনে একটি অণু পরিমাণও অহংকার থাকবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না।’ উপস্থিত একজন জানতে চাইলো, ‘হে আল্লাহর রাসূল, যদি কেউ এমন পছন্দ করে যে তার পোশাক ও জুতা সুন্দর দেখাক’। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ‘আল্লাহ নিজেই সুন্দর এবং তিনি সৌন্দর্য পছন্দ করেন। অহংকার মানে, সত্যকে প্রত্যাখান করা ও মানুষকে ছোট করে দেখা ।’ [মুসলিম : ৯১]

বন্ধুরা, নিশ্চয় শুনেছ ‘অহংকার পতনের মূল’। আজ আমরা সেই অহংকার বিষয়ে আলোচনা করব। অহংকার একটি ঘৃণিত চরিত্র যা উদ্ধত ইবলিসের বৈশিষ্ট্য। সর্বপ্রথম যে অহংকার করেছিল

আল্লাহ ও তাঁর সৃষ্টিজগতের প্রতি সে অভিশপ্ত ইবলিস শয়তান। যখন আল্লাহ তাকে আদেশ করেছিলেন আদম আলাইহিস সালামকে সিজদা করতে সে অহংকারের বশে সিজদা করতে অস্বীকার করেছিল। সে আগুনের তৈরি বলে সে নিজেকে উত্তম আর মাটির তৈরি বলে আদমকে অধম ভেবেছিল। তাই সংক্ষেপে বললে অহংকার বলতে বুঝায় অন্যকে ছোট আর নিজেকে বড় ভাবা। নিজেকে উত্তম আর অন্যকে অধম মনে করা। অহংকার এমন একটি পাপের স্বভাব যার বিন্দু পরিমাণই অপরাধ হিসেবে যথেষ্ট। সামান্য অহংকারই মানুষকে জাহান্নামে নিয়ে যাবে।

আমরা নানাভাবে অহংকার প্রকাশ করি, যখন কেউ সত্য গ্রহণে অস্বীকৃতি জানাই কিংবা অপ্রয়োজনে তর্কে জড়াই। সত্য অনুধাবনের পরও কেবল সত্য উপস্থাপনকারীর সঙ্গে অহং দেখিয়ে সত্য গ্রহণ করি না। যুগে যুগে অনেক ব্যক্তি ও গোষ্ঠী শুধু অহংকারের দরুণ সত্য থেকে বঞ্চিত হয়ে নিজের সর্বোচ্চ ক্ষতি করেছে। তেমনি যখন কেউ নিজেই নিজের সৌন্দর্য ও রূপে আহ্লাদিত হই, ভালো খাবার ও পোশাকের কারণে বড়াই করি ; নিজেকে মানুষের কাছে বড় করে মেলে ধরি আর অন্যকে করি তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য; তখনও আমরা অহংকার করি।

অহংকার কেন এত বড় অপরাধ? কারণ, আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও অহংকার সাজে না। আমরা অহংকার করি কোন

দুঃসাহসে? আমরা কত দুর্বল, কত অক্ষম তা কি একটু চিন্তা করে দেখেছি? তাহলে তো মনে কোনো অহংকারের উদয় হতে পারে না। আমাদের জন্ম কত দুর্বলভাবে। জন্মের পর আমরা কত অসহায় থাকি। মায়ের সাহায্য ছাড়া কিছুই করতে পারি না। যখন বড় হয়ে যৌবনে পৌঁছি, তারুণ্যে টগবগ করি তখনও আমাদের অসহায়ত্ব তখনো অবশিষ্ট থাকে। দেখ না, আল্লাহ আমাদের দেহে যে শৃঙ্খলাব্যবস্থা রেখেছেন তার সামান্য ব্যত্যয় হলেই আমরা কত অসহায় বোধ করি। সামান্য জ্বর-সর্দি হলেই দুনিয়াকে বিস্বাদ মনে হয়। যত ক্ষমতাবান, শক্তিশালী আর ধনীই হই না কেন আল্লাহ চাইলে মুহূর্তেই আমাকে অক্ষম বানাতে পারেন। পারেন আমার জীবনপ্রদীপ নিভিয়ে নিথর করে দিতে।

আল্লাহ আমাদের সে কথাই স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন কুরআনে,

﴿ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَحًاۖ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ۞ وَٱقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَٱغْضُضْ مِن صَوْتِكَۚ إِنَّ أَنكَرَ ٱلْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ ٱلْحَمِيرِ ۞ ﴾ [لقمان: ١٨، ١٩]

‘অহংকারবশে তুমি মানুষকে অবজ্ঞা করো না , পৃথিবীতে গর্বভরে পদচারণা করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ কোনো দাম্ভিক অহংকারীকে পছন্দ করেন না। জমিনে চলার সময় তুমি মধ্যমপন্থা অবলম্বন করো এবং কণ্ঠস্বর নিচু করো।’ {সূরা লুকমান : ১৮-১৯}

মনে রাখবে, অহংকারীকে কেউ পছন্দ করে না। অহংকারী সবার কাছেই ঘৃণার পাত্র। পক্ষান্তরে বিনয়ী, সভ্য, ভদ্র ও শান্ত ব্যক্তিকে সবাই পছন্দ করে।

পিতা-মাতার সঙ্গে সদ্ব্যবহার করবে

আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ بِحُسْنِ صَحَابَتِي؟ قَالَ: «أُمُّكَ» قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: «ثُمَّ أُمُّكَ» قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: «ثُمَّ أُمُّكَ» قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: «ثُمَّ أَبُوكَ»

এক ব্যক্তি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমার উত্তম আচরণ পাওয়ার অধিক হকদার কে? তিনি বললেন, তোমার মা। লোকটি বললেন, তারপর কে? তিনি বললেন, তোমার মা। অতঃপর লোকটি আবার বললেন তারপর কে ? তিনি বললেন , তোমার মা। অতঃপর লোকটি বললেন তারপর কে ? তিনি বললেন তোমার বাবা ’। [বুখারী : ৬২৯৮]

বন্ধুরা, আল্লাহ নারীকে মায়ের মর্যাদা দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। মাতৃত্বের কারণে মা জননী শ্রদ্ধা, সম্মান ও সুন্দর আচরণ পাওয়ার হকদার। তাই ‘মা’ নারী ও পুরুষ সবার কাছে মর্যাদার শিখরে অধিষ্ঠিত। এ নিখিল বিশ্বে মায়ের কোল হচ্ছে নিরাপদ আশ্রয়স্থল। মাতৃস্নেহ এক জান্নাতি নিয়ামত। ‘মা’ স্নেহের পরশ দিয়ে সন্তানদের হৃদয়কোণে স্বস্তি , সান্ত্বনা ও প্রশান্তি উপহার দেন।

সন্তানকে সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলেন। নয় মাস গর্ভে ধারণ করে 'মা' তার কলিজার টুকরোকে হৃদয়ের তন্ত্রী ছিঁড়ে অসহনীয় যন্ত্রণা ভোগ করে জীবন-মরণের সর্বো   চ্চ ঝুঁকি নিয়ে প্রসব বেদনার অবর্ণনীয় কষ্ট সহ্য করে এ উন্মুক্ত পৃথিবীতে ভূমিষ্ঠ করেন। জন্মের দু'বছর ধরে বুকের মধুময় স্তন্য পান করিয়ে তিল তিল করে বড় করে তোলেন। মায়ের এ কষ্ট তার নিজেকেই বহন করতে হয়। কোনো পুরুষ এ কষ্টের ভাগীদার হতে চাইলেও সম্ভব নয়। এ জন্য আল্লাহর রাসূল তিনবার মায়ের সঙ্গে সর্বোচ্চ সদ্ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছেন। এরপর বলেছেন বাবার কথা। বাবার অবদানও অস্বীকার করার মতো নয়। বাবার সঙ্গে পৃথিবীর আর কোনো পুরুষের তুলনা হয় না। তিনি নিজে কষ্ট করে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে সন্তানের জন্য উপার্জন করেন। সন্তানের সুখের জন্য সম্ভাব্য সবকিছুই করেন। আমাদের সকল আবদার পূরণে তিনিই তাঁর সর্বোচ্চ চেষ্টা নিয়োগ করেন। একজন রিকশাচালক বাবাও সোনামনির জ্বর হলে ঘামে নেয়ে দুধ-পাউরুটি আর কলা নিয়ে বাসায় ফেরেন। বিদ্যালয়ে বেতনসহ সবধরনের আর্থিক ব্যয় তিনিই বহন করেন। আর তিনিই সন্তানের অসুখ হলে ছুটে যান রাত-বিরাতে কিংবা শীত-বৃষ্টিতে ডাক্তারের কাছে। সন্তানের অসুখ হলে তিনি এক মুহূর্তও স্বস্তিতে থাকতে পারেন না।

সন্তানের কল্যাণার্থে যে কোনো সময় বাবা-মা নিজের জীবন বাজি রাখতে প্রস্তুত থাকেন। সন্তানের সামান্য রোগ-বালাই হলেও বাবা-মায়ের আরামের নিদ্রা হারাম হয়ে যায়। এ জন্যই মহান আল্লাহ নিজের হকের পাশাপাশি পিতামাতার হকের কথা বলেছেন।

আল্লাহ নির্দেশনা দিয়ে বলেন,

﴿۞وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعۡبُدُوٓاْ إِلَّآ إِيَّاهُ وَبِٱلۡوَٰلِدَيۡنِ إِحۡسَٰنًاۚ إِمَّا يَبۡلُغَنَّ عِندَكَ ٱلۡكِبَرَ أَحَدُهُمَآ أَوۡ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَآ أُفّٖ وَلَا تَنۡهَرۡهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوۡلٗا كَرِيمٗا ٢٣ وَٱخۡفِضۡ لَهُمَا جَنَاحَ ٱلذُّلِّ مِنَ ٱلرَّحۡمَةِ وَقُل رَّبِّ ٱرۡحَمۡهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرٗا ٢٤﴾ [الاسراء: ٢٣، ٢٤]

‘তোমার প্রতিপালক নির্দেশ দিয়েছেন যে, তোমরা তিনি ছাড়া অন্য কারো ইবাদত করবে না এবং পিতামাতার সঙ্গে সদ্ব্যবহার করবে , তাদের একজন অথবা উভয়েই তোমার জীবদ্দশায় বার্ধক্যে উপনীত হলে তাদেরকে বিরক্তিসূচক কিছু বলবে না এবং তাদের ভর্ৎসনা করো না , বরং তাদের সঙ্গে সম্মানসূচক কোমল ভাষায় কথা বলবে। অনুকম্পায় তাদের প্রতি বিনয়াবনত থাকবে এবং বলবে, হে আমার প্রতিপালক তাদের উভয়ের প্রতি দয়া করুন যেভাবে শৈশবে তারা আমাকে প্রতিপালন করেছিলেন। ’ {সূরা আল-ইসরা : ২৩-২৪}

পিতামাতা কী জিনিস তা শুধু তারাই বোঝে যাদের বাবা-মা দুনিয়ায় নেই। আমাদের এতিম নবী এ জন্য বহু হাদীসে

পিতামাতার সম্মান, মর্যাদা, অধিকার ও তাদের প্রতি আমাদের করণীয় নিয়ে বহু নির্দেশনা দিয়েছেন। পিতামাতাকে মনেপ্রাণে যেমন সম্মান করতে হবে , তেমনি তাঁদের সেবাও করতে হবে যথাসাধ্য। সবচে জরুরি হলো তাঁরা সামান্যতম কষ্ট পেতে পারেন এমন কোনো কথা বলা যাবে না এবং এমন কোনো কাজও করা যাবে না।

রাগান্বিত হয়ো না

আবূ হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত,

أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَوْصِنِي، قَالَ: «لاَ تَغْضَبْ» فَرَدَّدَ مِرَارًا، قَالَ: «لاَ تَغْضَبْ»

জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সালালাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে এসে বললেন , আমাকে কিছু উপদেশ দিন। রাসূল সালালাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন , রাগান্বিত হয়ো না। সে ব্যক্তি বারবার উপদেশ চাইলে রাসূল (একই উত্তর দিয়ে) তাকে বললেন, রাগান্বিত হয়ো না'। [বুখারী : ৫৬৫১]

মানুষ মাত্রেই তার রাগ-ক্রোধ থাকবেই। কিন্তু এ রাগ যে দমন করতে পারে, রাগের সময় যে নিজের মাথা ঠা ণ্ডা রাখতে পারে আর নিজেকে সংযত রাখে, সেই প্রকৃত বীর এবং বুদ্ধিমান ব্যক্তি। রাগের মাথায় নিজের ক্ষতি করে পরবর্তীতে আফসোস করা বুদ্ধিমানের পরিচায়ক নয়। যেমন ধরো , স্কুলে তোমার সহপাঠী তোমাকে ঠাট্টা-মশকরার ছলে এমন কিছু বলে ফেলল , যাতে তোমার রাগ দমন করা কঠিন হয়ে পড়লো। আর তুমি রাগের মাথায় তুমি নিজের হাতে থাকা ভারি কিছু তার দিকে ছুড়ে মারলে। তারপর যা হবার তাই হলো। তার মাথা ফেটে গেল। হাসপাতালে দৌড়াদৌড়ি। আর আব্বু-আম্মুর বকার ভয়ে তোমার

প্রাণ যায় যায় অবস্থা। কিংবা তুমি রাগের মাথায় তোমার মামার কিনে দেওয়া খুব সুন্দর পেন্সিল বক্সটিকে আছাড় দিয়ে ভেঙ্গে ফেললে। তারপর যখন রাগ নেমে গেল , তখন নিজেই ভাবতে লাগলে, ধুর, পাজি ছেলেটার ওপর রাগ ঝাড়তে গিয়ে বোকার মতো নিজের প্রিয় জিনিসটাই ধ্বংস করে দিলাম। দেখ এজন্যই আমাদের প্রিয় নবী সুন্দর উপমা দিয়েছেন । আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«لَيْسَ الشَّدِيدُ بِالصُّرَعَةِ، إِنَّمَا الشَّدِيدُ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الغَضَبِ»

'সে প্রকৃত বীর নয় যে কুস্তিতে নেমে অন্যকে ধরাশায়ী করতে পারে; বরং সে-ই প্রকৃত বীর যে রাগের সময় নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে'। [বুখারী : ৬১১৪]

রাগী ব্যক্তিকে মানুষ পছন্দ করে না। রাগ হলো শয়তানের প্রবেশদ্বার। এ পথে প্রবেশ করে মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধি নিয়ে সে খেলা করে। বেশি রাগলে শয়তান তোমাকে দিয়ে এমন কিছু করিয়ে নেবে যা তুমি স্বাভাবিক অবস্থায় মোটেও করতে না। রাগ পাপ কাজের দ্বার উন্মুক্ত করে। সমাজে বিরাজমান পারস্পরিক আন্তরিকতা ও সৌহার্দ্যকে ভেঙে দিয়ে বিশৃঙ্খলা ও অমানবিকতা সৃষ্টি করে। রাগ স্বাস্থ্যের জন্য খুবই ক্ষতিকর। কেননা অত্যধিক রাগ শরীরের নিয়ন্ত্রক মস্তিষ্কে আঘাত হানে। ফলে তা বহুমূত্র ,

রক্তচাপ ও হার্টের দুর্বলতাসহ অনেক রোগের কারণ হয়। রাগের পরিণাম হলো, নিজের সম্পদ ধ্বংস করা এবং মানুষের রোষানলে পতিত হওয়া। এ কারণেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বারবার প্রশ্ন করা সত্ত্বেও রাগ দমনের উপদেশ দিয়ে এর গুরুত্ব তুলে ধরেছেন। রাগ দমন করতে পারা তাই বড় গুণ এবং নেকীর কাজ। রাগ দমনকারীকে আল্লাহ ভালোবাসেন। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ বলেন,

﴿ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي ٱلسَّرَّآءِ وَٱلضَّرَّآءِ وَٱلۡكَٰظِمِينَ ٱلۡغَيۡظَ وَٱلۡعَافِينَ عَنِ ٱلنَّاسِۗ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلۡمُحۡسِنِينَ ١٣٤﴾ [ال عمران: ١٣٤]

'যারা সুসময়ে ও দুঃসময়ে ব্যয় করে এবং ক্রোধ সংবরণ করে এবং মানুষকে ক্ষমা করে। আর আল্লাহ সৎকর্মশীলদের ভালোবাসেন|' {সূরা আলে ইমরান, আয়াত : ১৩৪}

রাগ থেকে বাঁচার কিছু উপায় : (ক) যে সমস্ত কারণে রাগ সৃষ্টি হয় সেগুলো থেকে দূরে থাকা। (খ) মুখ ও অন্তর দ্বারা আল্লাহর জিকির করা। কেননা, ক্রোধ হল শয়তানের কুপ্রভাবের বিষক্রিয়া। তাই যখন মানুষ আল্লাহর জিকির করে তখন শয়তানের প্রভাব মুক্ত হয়ে যায়। (গ) ক্রোধ পরিত্যাগ ও মানুষকে ক্ষমার সওয়াবের কথা স্মরণ করা| (ঘ) ক্রোধের মন্দ পরিণতির কথা স্মরণ করা। (চ) ক্রুদ্ধ ব্যক্তির অবস্থান পরিবর্তন করা , যে অবস্থায় ছিল তার পরিবর্তে অন্য অবস্থা গ্রহণ করা। (ছ) ও যু করা, তা এই জন্য যে

ক্রোধ মূলত শয়তানের পক্ষ থেকে। আর শয়তান আগুনের তৈরি। আর আগুন নেভাতে পানি। (জ) যখন ক্রোধ আসবে ,
তখন আউযুবিল্লাহি মিনাশ-শাইতানির রাজীম পড়া।

অন্যকে বিরক্ত করো না

আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ لَا يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ»

'ওই ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না যার প্রতিবেশি তার অনিষ্ট থেকে নিরাপদ নয়'। [মুসলিম : ৪৬]

আবু শুরাইহ আনসারী রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«وَاللّٰهِ لاَ يُؤْمِنُ، وَاللّٰهِ لاَ يُؤْمِنُ، وَاللّٰهِ لاَ يُؤْمِنُ» قِيلَ: وَمَنْ يَا رَسُولَ اللّٰهِ؟ قَالَ: «الَّذِي لاَ يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَايِقَهُ»

'আল্লাহর কসম! সে মুমিন নয় , আল্লাহর কসম! সে মুমিন নয় , আল্লাহর কসম! সে মুমিন নয়। জিজ্ঞেস করা হল , হে আল্লাহর রাসূল, কে সেই ব্যক্তি ? তিনি বললেন, যার অনিষ্ট বা ডিস্টার্ব থেকে তার প্রতিবেশী নিরাপদ থাকে না।' [বুখারী : ৬০১৬]

মানুষ সামাজিক জীব। পৃথিবীর সূচনালগ্ন থেকেই মানুষ সমাজবদ্ধ হয়ে বসবাস করে আসছে। সমাজজীবন সুন্দর ও শান্তিময় হোক সেটা সবার কাম্য। সমাজজীবনে শান্তি ও সৌহার্দ্য বজায় রাখতে

প্রয়োজন শৃঙ্খলা বজায় রাখা। একের আচরণে দশের বিরক্তি উৎপাদন না করা। নিজের কথা ও কাজ দ্বারা কোনোভাবে অন্যকে কষ্ট না দেওয়া। ইসলাম এ ক্ষেত্রে সুন্দর শিক্ষাচার শিক্ষা দিয়েছে।

আমরা দৈনন্দিন জীবনে প্রায়শই নানাভাবে অন্যকে বিরক্ত করি । অন্যের বিরক্তি ও অশান্তির কারণ তৈরি করি। তুমি যখন সর্বোচ্চ ভলিয়মে গান শুনে নিজের স্বাধীনতা ভোগ করো, খেয়াল করলেই দেখবে নিজের স্বাধীনতা চর্চার পাশাপাশি অন্যের স্বাধীনতায়ও কেমন অন্যায় হস্তক্ষেপ করছ। অসুস্থ কিংবা ঘুমন্ত কোনো শিশু বা বৃদ্ধের শান্তি বিনষ্ট করছ, ছাত্রছাত্রী বা পরীক্ষার্থীর পড়ায় ডিস্টার্ব করছ অথবা নামাজ বা কুরআন তিলাওয়ারত কাউকে বিরক্ত করে পাপ কুড়াচ্ছ।

আবাসিক এলাকায় মুক্ত কর্নসার্টের আয়োজন করে, নিজের বাসায় টিভির ভলিয়ম বাড়িয়ে , অযথা মোবাইলে চেঁচিয়ে কথা বলে , অপ্রয়োজনে গাড়ির হর্ন বাজিয়ে , মানুষের বিশ্রাম ও নীরবতার সময় বেপরোয়া মাইকিং করে আমরা অন্যকে কষ্ট দেই।

ভুক্তভোগী মুসল্লিমাত্রই জানেন মসজিদের মতো নীরব ও সুশান্তস্থানে মোবাইলের বিকট রিংটোন কিভাবে এর পবিত্রতা ও গাম্ভীর্য নষ্ট করে। তেমনি প্রতিবেশির চলার পথে আবর্জনা ফেলে কিংবা তার বিরক্তির কারণ বাড়িয়ে তাকে কষ্ট দেই।

প্রতিবেশির কষ্টের কারণ না হতে ইসলামে বারবার সতর্ক করা হয়েছে। প্রতিবেশির অধিকার রক্ষা ও সামাজিক শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে সর্বোচ্চ গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। আল-কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ وَٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَٰتِ بِغَيْرِ مَا ٱكْتَسَبُوا۟ فَقَدِ ٱحْتَمَلُوا۟ بُهْتَٰنًا وَإِثْمًا مُّبِينًا ﴿٥٨﴾ ﴾ [الاحزاب: ٥٨]

'যারা বিনা অপরাধে মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীদেরকে কষ্ট দেয় তারা মিথ্যা অপবাদ ও প্রকাশ্য পাপের বোঝা বহন করে। ' {সূরা আল-আহযাব : ৫৮}

প্রতিবেশী আত্মীয় হোক অথবা অনাত্মীয় , মুসলিম হোক অথবা অমুসলিম যেকোনো অবস্থায় সাধ্যানুযায়ী তাদের সাহায্য-সহযোগিতা করা , তাদের সঙ্গে উত্তম আচরণ করা সর্বোপরি তাদের ত্যক্ত বা বিরক্ত না করা আল্লাহর নির্দেশ। আল্লাহ বলেন,

﴿ ۞وَٱعْبُدُوا۟ ٱللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا۟ بِهِۦ شَيْـًٔا ۖ وَبِٱلْوَٰلِدَيْنِ إِحْسَٰنًا وَبِذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَٰمَىٰ وَٱلْمَسَٰكِينِ وَٱلْجَارِ ذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْجَارِ ٱلْجُنُبِ وَٱلصَّاحِبِ بِٱلْجَنۢبِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُمْ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا ﴿٣٦﴾ ﴾ [النساء: ٣٦]

'আল্লাহর ইবাদত কর, তাঁর সঙ্গে কাউকে শরীক করো না। পিতা-মাতার সঙ্গে সদ্ব্যবহার কর এবং নিকটাত্মীয় , ইয়াতীম, মিসকীন, নিকটবর্তী প্রতিবেশী ও দূরবর্তী প্রতিবেশী , সহকর্মী, পথিক ও

দাসদাসীর সঙ্গে ভালো ব্যবহার কর। নিশ্চয় আল্লাহ অহংকারী-দাম্ভিককে পছন্দ করেন না।' {সূরা আন-নিসা : ৩৬}

আবু শুরাইহ আনসারী রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«وَاللَّهِ لاَ يُؤْمِنُ، وَاللَّهِ لاَ يُؤْمِنُ، وَاللَّهِ لاَ يُؤْمِنُ» قِيلَ: وَمَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «الَّذِي لاَ يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَايِقَهُ»

'আল্লাহর কসম! সে মুমিন নয় , আল্লাহর কসম! সে মুমিন নয় , আল্লাহর কসম! সে মুমিন নয়। জিজ্ঞেস করা হল , হে আল্লাহর রাসূল, কে সেই ব্যক্তি ? তিনি বললেন, যার অনিষ্ট বা ডিস্টার্ব থেকে তার প্রতিবেশী নিরাপদ থাকে না।' [বুখারী : ৬০১৬]

অতএব সর্বদা সতর্ক থাকবে, তোমার আচরণে কেউ যেন বিরক্ত না হয়। তোমার কর্মকাণ্ড বা চলাফেরায় যেন কেউ কষ্ট না পায়।